আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব (نَجَاحُ الدَّعْوَةِ وَأَثَرِهَا)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব

এখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনের শেষ দিনগুলো আলোচনার পর্যায়ে পৌঁছেছি। কিন্তু এ আলোচনার জন্য কলমকে গতিশীল করার পূর্বে তাঁর সফল, বিচিত্র ও বিশিষ্ট জীবনধারা যা অন্যান্য নাবী ও রাসূলগণের তুলনায় তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছিল এবং প্রাধান্য প্রদান করেছিল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম (ﷺ)-এর মাথার উপর পূর্ব ও পরের সকল নেতৃত্বের মুকুট স্থাপন করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ)-কে বলা হয়,

(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ـ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا) الآيات [المزمل:1، 2]

'ওহে চাদরে আবৃত (ব্যক্তি)! ২. রাতে সলাতে দাঁড়াও তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে।' (আল-মুয্যাম্মিল (৭৩) : ১-২]

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ قُمْ فَأَنذِرْ) [المدثر:1، 2]

'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। [আল-মুদ্দাসসির (৭৪) : ১-২]

অতঃপর কী ছিল? প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং এ পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অনবরত দন্ডায়মান রইলেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মান বিকাশের সুমহান দায়িত্ব, একত্ববাদ বিশ্বাসের গুরুদায়িত্ব এবং আল্লাহর আমানত বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট গন্তব্যের পানে এগিয়ে চলা যা জাহেলিয়াত যুগের গাঢ় অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, যা বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী ভাবধারায় ছিল দারুনভাবে ভারাক্রান্ত যা ছিল পশু প্রবৃত্তি ও লালসার বেড়াজালে আবদ্ধ। অতঃপর একদল অত্যন্ত বিবেকসম্পন্ন, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত সাহাবার সহায়তায় সব কিছুকে পরাভূত ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে আল্লাহর ধ্যান ধারণা ও আলোয় সমুজ্জ্বল এক প্রান্তরে গিয়ে যখন দন্ডায়মান হলেন তখন আরম্ভ হল ভিন্নতর এক জীবন সংগ্রাম।

আরম্ভ হল যুদ্ধের পর যুদ্ধ সে সকল শত্রুর বিরুদ্ধে দাওয়াত ইলাহী এবং তার বিশ্ববাসীদের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শিশু ইসলাম চারাটি তরতাজা হয়ে ভূগর্ভে তার শিকড় প্রোথিত এবং উন্মুক্ত আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করানোর পূর্বেই চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করে ফেলতে। দ্বীনে ইলাহির দাওয়াতে ঐ সকল শত্রুর সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ)-কে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশাল রোমক বাহিনী এ নতুন উম্মতকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সীমান্ত এলাকায় সৈন্য মহড়া শুরু করে দেয়।

যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রসজ্জিত মুশরিক, মুনাফিক্ব ও কাফিরদের সঙ্গেই যে তাঁকে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল শুধু তাই নয় বরং আরও এক ভয়ংকর এবং সার্বক্ষণিক শত্রুর সঙ্গে তাঁকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। সে শত্রুটি ছিল মানব জাতির চির শত্রু শয়তান। সে মানুষের শিরায় শিরায় বিচরণ করে মানুষকে এক গোমরাহী

ও ভ্রষ্টতার অতল গহবরে নিমজ্জিত করার জন্য সর্বক্ষণ চক্রান্ত চালাতে থাকে। শয়তানের চক্রান্তের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে মুসলিমগণকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সে সবের মোকাবিলা করে করে সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁরা সাহাবীগণ যে নিষ্ঠা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর দ্বীনের দাওয়াতের যে মহাসম্মানজনক এবং মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁরা অন্য কিছুকে বড় করে দেখতেন না। দ্বীনের কাজে অকাতরে তাঁরা দিতেন প্রাণ এবং সর্বস্ব দিয়ে একদম নিঃস্ব হয়ে যেতে তাঁরা কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদতলে যখন সঞ্চিত হতো সম্পদের পাহাড় সে সব আল্লাহর পথে খরচ না করে তিনি অবসর নিতেন না। তাঁর নিকট প্রাচুর্য ছিল পরিত্যাজ্য, দারিদ্র ছিল কাম্য। দিবাভাগে দ্বীনের দাওয়াত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সর্বক্ষণ থাকতেন তিনি ব্যস্ত, রাত্রিবেলা দীর্ঘ সময় প্রভূর উদ্দেশ্যে থাকতেন নিবেদিত।[1]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমনিভাবে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনায় বিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় তাঁকে অন্যান্য বিষয় হতে উদাসীন কিংবা গাফেল করতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থঃবহু প্রতিকূলতা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াত এমনি এক বিশালায়তনে কৃতকার্যতা লাভ করেছিল যে, তা প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব বিবেক একেবারে স্তম্ভিত এবং হতচকিত হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূভাগ থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে ঈমান আমান, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও শৌর্য-বীর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং শিরক্, কুফরী, মুনাফিক্বী ও মূর্তিপূজার মূল উৎপাটিত হয় এবং আপামর আরববাসী দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুগত হয়ে পড়ে। আল্লাহর একত্ববাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র মুয়াযিযনের সুরেলা কণ্ঠে দিগ্বিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। মদীনা অভিমুখী বিভিন্ন গোত্রের আনাগোনা, নব্য মুসলিমগণের তাকবীরধ্বনি এবং কুরআন তিলাওয়াতকারীগণের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সুরে মরুপ্রান্তর মউ মউ করে ওঠে।

ভিন্ন ও পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন বহুধাবিভক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য, সহৃদয়তা ও সমঝোতার প্লাবন প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ প্রবেশ করতে থাকে আল্লাহর দাসত্বে। কেউই অত্যাচারী রইল না কিংবা অত্যাচরিতও রইল না। রইল না মালিক কিংবা মামলুক, না হাকিম, না মাহকুম, না যালিম কিংবা মাযলুম। সব ভেদাভেদের অবসান হয়ে গেল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারী। অন্যথায় সকল মানুষ আদমসন্তান এবং আদম (আঃ) মাটির সৃষ্টি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল আরবী একাত্মতা, বিশ্ব মানবতার একাত্মতা এবং সামাজিক সুবিচার। পাওয়া গেল মানব জাতির সমস্যা-সংকুল পার্থিব জীবনে চলার পথের ঠিক দিক নির্দেশনা এবং পরকালীন কল্যাণের মূলমন্ত্র। মানুষের জীবনযাত্রায় সূচিত হল আমূল পরিবর্তন। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই সূচিত হল যুগান্তকারী পরিবর্তন। মানব সভ্যতা হল মানবোচিত ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্য মন্ডিত।

ইসলামী দাওয়াতের পূর্বে পৃথিবীতে ছিল অন্ধকারের প্রাধান্য, পৃথিবীর পরিবেশ ছিল দুর্গন্ধযুক্ত এবং আত্মা ছড়িয়ে

চলেছিল দুর্গন্ধ। মাপ ও পরিমাপ ছিল অস্পষ্ট। সর্বত্র বিরাজিত ছিল অন্যায়, দাসত্ব, শোষণ ও সন্ত্রাসের শাসন। অশান্তি, অশ্লীলতা এবং ধ্বংস প্রবণতা পৃথিবীকে চরম অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত করছিল। কুফর ও ভ্রষ্টতার ঘন পর্দায় ঢাকা পড়েছিল মানুষের সনাতন জীবনধারার শাশ্বত রূপ। অথচ আসমানী জীবন বিধান ছিল তখনো বিদ্যমান। কিন্তু সে বিধান হয়ে পড়েছিল বিকৃত এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। সে বিধানের গ্রহণী শক্তি গিয়েছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে। যার ফলে তা প্রাণহীন একটি লোকাচার বা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াত যখন তার অসামান্য প্রাণশক্তি, সর্ববাদীসম্মত আল্লাহর বিধি বিধান, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তখন প্রচলিত রেওয়াজ সর্বস্ব জীবনের বিধানের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নামে যে অর্থহীন লোকাচার, শ্রেণীবিভেদ, অহমিকা, অস্থিরতা, শিরক ও বহুত্ববাদী, বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটল। আর মানব সমাজ মুক্তি লাভ করল যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, জোবরদস্তি থেকে। মুক্ত হলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া, পতন থেকে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে দলাদলি, শাসক ও পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটল। সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল এক দয়া ও পরিচ্ছন্নতা, নতুনত্ব, ঈমান ইয়াক্বীন, ন্যায়নিষ্ঠতা, সহমর্মিতা এবং মানব জীবন স্বচ্ছ-নির্মল এক মহা উন্নত সোপানে উন্নীত হয়, প্রত্যেক প্রাপক তার প্রাপ্য অধিকার নিশ্চয়তা লাভ করে এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উপর।

এর ফলে আরব উপদ্বীপে এমন এক বরকতপূর্ণ পরিবেশ এবং উন্নত ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা সূচিত হল ইতোপূর্বে কোন কালেও যা দেখা যায় নি এবং সে সময়কার মতো উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় ইতিহাস আর কোন কালেও দেখা যাওয়া সম্ভব নয়।[2]

ফুটনোট

[1] সৈয়দ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন ২৯ খন্ড ১৬৮-১৬৯ পৃঃ।

[2] সৈয়দ কুতুব, ভূমিকা মা-যা খাসেরাল আলামু বিইনাহিতা তিল মুসলিমীন পৃষ্ঠা ১৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6450

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন